কবিতার অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

ইভ বনফোয়া

ঝুরো বরফ নেমে এলো হঠাৎ সেপ্টেম্বর পেরিয়ে গোটা আর্কেডের হলুদ দুপুরে। আমার সিগারিলো নিভে গেছে। এই ফাগুন হাওয়া বাঁচিয়ে আবার অগ্নিসংযোগ করতে গেলে বুথের ভেতরে যেতে হয়। ছাতা-সীট থেকে উঠে আসছি, হঠাৎ দেখি কালো পুলওভারের বুকের কাছে অনেকগুলো বই আঁকড়ে ধরে নাতালিয়া এদিকে হেঁটে আসছে। প্রায় এক দশক পর দেখা - আমরা দুজনেই চমকে উঠে একে অন্যের চোখে ইস্ক্রুপ চালিয়ে দিই। এবং ঠিক এর মধ্যেই নাতালিয়ার হাত থেকে দুটো বই মাটিতে পড়ে যায়। ও ঝোঁকে, আমিও। আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকা সবচেয়ে কাছের গেরুয়া রঙের বইটা তুলে উল্টে চমকে উঠি।

ঠিক এখান থেকেই সেদিন নাতালিয়ার সঙ্গে আবার আমার বনফোয়া-সংলাপ শুরু। আবার কফি-সীটে ফিরে যাই। সঙ্গে নাতালিয়া। কুশল বিনিময় ও ৯ বছরের ফাঁক বোঁজাতে লাগে ঠিক ন-মিনিট। শুরু হয়ে যায় ইভ বনফোয়াকে নিয়ে আমাদের ফিরে পাওয়া আলাপ। নাতালিয়া বলে ,

- কত সাল সেটা ?
- ১৯৮৭।
- মনে আছে বনফোয়াকে নিয়ে কথাবার্তা ঠিক কখন উঠেছিলো আমাদের মধ্যে ?
- হুবহু।
- তখন আমরা সী-বীচে ছিলাম, না ? কি যেন শহরটার নাম ?
- চাঁদিপুর।
- হ্যাঁ , হ্যাঁ , মনে পড়েছে , চ্যান্ডিপুর। তুমি বলেছিলে বনফোয়ার চেয়ে রোম্যান্টিক কবির কবিতা আর পড়োনি। তাই না ?
- সত্যিই ! কি অবস্থা তখন। তাছাড়া তখন কত বয়স আমাদের ? বাইশ ? বাইশ বছরে.....
- বয়স এমন কিছু কম ছিলো না, বাইশ বছরে অনেকেই ইউরোপে বনফোয়া পড়ে, আমেরিকাতেও।
- হ্যাঁ , কিন্তু ভারতে ? কটা ভারতীয় ছেলে ভারতে বসে ১৯৮৭তে বনফোয়া পড়েছে বলতো ? আর রোমান্টিকতা তার মধ্যে যে পেয়েছিলাম সেটার মূল দোষ কিন্তু আমাদের ভাষার এক কবির।
- কে ?
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আই মিন, ঐ যে - ডেজ অ্যান্ড নাইট্স ইন দ্য ফরেস্ট ? তার অথার।
- ও ইয়া ..... তুমি বলেছিলে বটে এঁর কথা....আয়ওয়া না কোথায় যেন একটি আমেরিকান মেয়ের প্রেমে
- না , না আমেরিকান না, ফরাসী .....

যে বছর আমার জন্ম, একটি তিরিশের কাছাকাছি বাঙালী ছেলে, কবি, আমেরিকার একটা ছোট শহরে একটা ছোট অ্যাপারমেন্টে বিছানায় শুয়ে রয়েছে একটি সমবয়সী ফরাসী মেয়ের সঙ্গে। দুজনেই সম্পুর্ণ নগ্ন, কল্পনা করে নিচ্ছি কেউ কাউকে ছুঁয়ে নেই। কেবল পাশাপাশি শুয়ে তারা ইভ বনফোয়ার কবিতা পড়ে। মেয়েটি প্রথমে পড়ে ফরাসীতে, পরে ইংরেজীতে তর্জমা করে দেয়। ছেলেটি শোনে। আর আমি এসব পড়ি ১৭/১৮ বছর বয়সে এসে। এর পরও যদি বনফোয়াকে রোমান্টিক কবি না ভেবে থাকি 'রোমান্টিক' শব্দটাই হয়তো ধোঁয়াশা ।

আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সদস্য হতে হল স্রেফ এই ইভ বনফোয়ার জন্যই। সেখানে পেয়ে গেলাম তাঁর কিছু বই। বিশেষ করে - Pierre ecrité (প্রস্তরলিখিত, ১৯৬৫) । কবিতা পড়তে গিয়ে খুব হোঁচট খাই। ধোঁয়াশা এসে সমস্ত রোমান্টিকতাকে মুহূর্তে গ্রাস করে। তবু গোয়াঁড় রোমান্টিক গঙ্গায় ডুবসাঁতার দিয়েও দেবীর মুখটি খুঁজতে যায়। ঠিক এই সময় নাতালিয়ার সঙ্গে আলাপ। রজত, আমার ইস্কুলের বেঞ্চবন্ধু মার্কিণ মুলুকে পড়তে গেছে। মধ্যে মধ্যে, গ্রীষ্মে, গ্রীষ্মে দেশে ফেরে। সেবার সঙ্গে নিয়ে এলো তার মার্কিণ বান্ধবীকে। সদলবলে চাঁদিপুর বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করি নাতালিয়ার সাহিত্যে মেজর। আমার মত তারও অসুখের নাম কবিতা। চাঁদিপুরেই একদিন সাগরসৈকতে, নাতালিয়া একটা সিঁদুরেসোহাগী রঙের কস্ট্যুম গায়ে বালিমাখামাখি, আমি তার পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে পিঠ তাতাচ্ছি, কি করে যেন ইভ বনফোয়ার কথা এলো।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

নাতালিয়া আমায় চমকে দিয়ে বললো সে বনফোয়ার কবিতা পড়েছে। আমি তাকে আমার সেরা রোম্যান্টিক কবি বলতেই নাতালিয়ায় নাক কুঁচকে গেল। আমি ভাবলাম চাঁদিপুরের গ্রীষ্ম তার চাঁদি না ফাটাতে পারলেও, নাকে ঘামাচি দিয়েছে। ভুল ভেবেছিলাম। ফিরে গেল নাতালিয়া মাসখানেক পর। আরো কয়েক মাস কাটলো। আমার জন্য একদিন সে পাঠাল বনফোয়া ও অন্যান্য কবিদের ৪টে বই। ইভ বনফোয়া সম্বন্ধে কেটে গেল আমার সমস্ত রোমান্টিকতা।

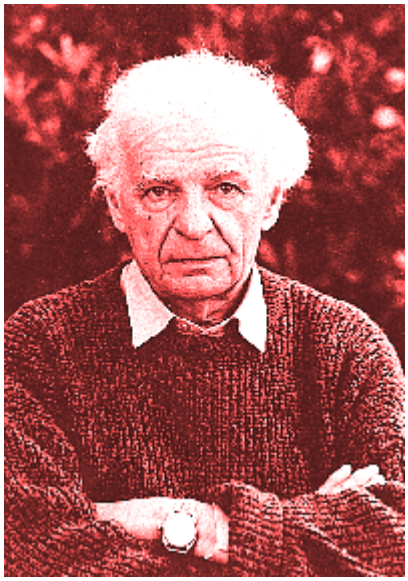

ইভ বনফোয়া, একুশ শতকের প্রাক্কালে

কিন্তু বনফোয়া ফিরে ফিরে আসতে লাগলেন। বছরের পর বছর। এমনকি আজো। আজো তার কবিতায় হরিণের কথা পড়লে গেরুয়া রঙের কথা ভাবি। তলিয়ে যেতে থাকি তার গেরুয়া, সাধু কবিতার প্রগাঢ় দর্শনে। সেই ইভ বনফোয়া আজো বেঁচে আছেন। ১৯৯১ সালে বেরিয়েছে তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্ত 'তুষারের শুরু ও শেষ' । বিশ শতকের ধ্রুপদী কবিতা নিয়ে কোন আলোচনা বনফোয়াকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। বহুবার তাঁর নাম উঠে এসেছে সম্ভাব্য নোবেল বিজয়ী হিসেবে। হয়ত এ বছরও ফিরে আসবে তাঁর নাম। শিল্পকলা নিয়ে, বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে, কবিতাতত্ত্ব নিয়ে, কবিতাপাঠ নিয়ে বনফোয়া প্রণীত গ্রন্থ প্রচুর। তবু পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞার বাজপাখিটিকে তার নিজের ডিমের ভারই বারবার মাটিতে নামিয়ে আনে। সেই ডিমটিই ইভ বনফোয়ার কবিতা। যার প্রকোষ্ঠেই লুকিয়ে আছে সেই ওড়নকলার গুণাবলি, সেই পাখির চোখে নীচের বিরাট দেখা। 'তুষারের শুরু ও শেষ' কবিতায় বনফোয়া লিখছেন -

মাঝে মাঝেই দুটি তুষারকণার দেখা হয়, মিলন ঘটে/ নতুবা একজন সম্ভ্রান্তরূপে ঘুরে চলে যাবে/ তার কণামাত্র মৃত্যুর দিকে

সামান্য শব্দের এই এত উজ্জ্বল / এলো কোথা থেকে / যখন একজন রাত্রি শুধু / আর অন্যজন স্বপ্ন ?

জন্ম-মৃত্যু, বা ঘন-তরলের সাদা-কালো বাইনারির প্রতি পশ্চিম সমাজের শিল্পকলার একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। অনেকে তর্ক করেন, এই দ্বিত্ব বা দ্বন্দ্ব খ্রীষ্টধর্মজাত। ঈশ্বর (God)-শয়তানের (Satan) বিরোধ থেকেই এই দুমুখিনতার জন্ম। কিন্তু বনফোয়ার গভীর, দার্শনিক কবিতা, এই চিরকালীন দ্বন্দ্বের মুখে দাঁড়িয়েও অন্য রাস্তা খোঁজে। জীবনের শেষভাগের কবিতাতেও সেই সন্ধান তাঁর জারি। রাত্রি আর স্বপ্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝতে পারছেন যে 'শব্দের উজ্জ্বল' এর সূত্রে যে আলোকময় তার অবস্থান অন্যত্র, কবিতা তাকে খুঁজেই লেখা। অনবরত, চিরকাল।

ঐ একই কবিতার শেষ ছত্রে বনফোয়া লেখেন -

কোথা থেকে আসে ঐ একজোড়া
সচল, সুহাস ছায়ারা
ওদের একজন আগাগোড়া
লাল উলে ঢাকা

লাল উলের মধ্যে জীবনের উত্তাপ আমরা খুঁজবো না অন্য কিছু, সেটা পাঠকের জন্য ছেড়ে দেওয়া যাক। আমি আঙুল দেখাবো ঐ 'একজন' শব্দটির দিকে। আবার 'জোড়া' বলা হলেও, শেষ পর্যন্ত ঐ একজনের কথাই বলা হল, অন্যজনকে ছেড়ে। সিমেট্রি ভেঙে দেওয়া হল। বাইনারির দিকে হেলে যাবার সহজ ফাঁদে পা দিলেন না বনফোয়া।

ইভ বনফোয়ার জন্ম ফ্রান্সের তুর শহরে। ১৯২৩ সালে। বাবা মারিয়াস এলি বনফোয়া সামন্য রেলকর্মী। ট্রেনের কামরা জোড়ালাগানো তার কাজ। ইভের বয়স যখন সবে তের, তাঁর বাবা মারা যান হঠাৎ। মা হেলেন মরী শিক্ষকতা করে কোনক্রমে সংসার টানেন। ছেলের পড়াশোনা দেখেন। ছেলেবেলা থেকেই ইভ লেখাপড়ায় ভালো। তুরের নামজাদা ইস্কুল লাইসি দেকার্তে-তে পড়তেন। ১৯৪৪ সালে প্যারীতে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখান থেকে বি এ করেন দর্শনে। পাশাপাশি গণিতেও তাঁর মাথা বরাবর ভালো। পোয়াতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করেন গণিত নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জলপানির ওপর ভরসা করে গোটা ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে ঘুরে বনফোয়া অধ্যয়ন করেন শিল্প-ইতিহাস। আজো এই এলাকাতেই কাজ করেন তিনি।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্যারীতে থাকার সময়েই অধিবাস্তবতাবাদী কবি-লেখক-শিল্পীদের ডেরায় তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। অধিবাস্তবতা - তাঁর নিজস্ব ভাবনার শুরু এখানেই। একইসঙ্গে, সম্ভবত এই বৃত্তের প্রভাবেই মৌলিক কবিতা রচনা শুরু হয়। প্রথম কবিতার বই ১৯৪৬ সালে। চটি বই। শুরুয়াত মাত্র। ১৯৫৩ সালে, তিরিশ বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায় - দ্যুভের চলাচল ও অচলতা বিষয়ক (*Du Mouvement et de l'immobilité de Douve*) । তিরিশ বছরের এক অল্প-পরিচিত যুবকের পক্ষে অতি-দার্শনিক, নিগূঢ় এক কবিতাবলি যেখানে দ্যুভ নাম্নী এক কল্পিত ঐতিহাসিক চরিত্রের বয়ানে লেখা হচ্ছে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের এক অপরূপ গাথাকবিতা। এই কাব্যগ্রন্থই ইভকে রাতারাতিভাবে প্রথমসারিতে বসিয়ে দেয়। যুদ্ধ পরবর্তী ফ্রান্সে, বিশেষত প্যারী শহরের সাহিত্যমহলে, এভাবে প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের পরপরই পাংক্তেয় হতে পারাটা যে প্রায় কষ্টকল্পনা সেটা তৎকালীন ফরাসী কবিতার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। পল এল্যুয়ার, লুই আরাগঁ, ফ্রাঁসিস পঁজ, সঁ জ্যঁ পের্স, ফিলিপ ঝাকোতেত, ঝাক হ্রেদা, হ্রেনে শ্যার, পীয়ের রেভের্দি, ঝাক প্রেভের তখন ফরাসী কবিতাপাঠকের সমস্ত আকর্ষণ কেড়ে রেখেছেন। সদ্য প্রয়াত পল ভ্যালেরীর কবিতাও সমালোচকের তাজা স্মৃতিতে। এঁরা প্রত্যেকেই তুমুলভাবে আন্তর্জাতিক কবি তখন। এই নক্ষত্রমালায় মিশে যাওয়া এক তিরিশ বছরের তরুণের পক্ষে সহজ ছিল না। আরো ৫ বছর পর ইভ বনফোয়ার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *Hier régnant désert* যখন বেরোলো ১৯৫৮-য়, অনেকেই তাঁকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি আখ্যা দিতে শুরু করেছেন।

১৯৬৭ সালে বনফোয়া ল্যুই হ্রেনে, জাত্যাঁ পিকোঁ ও আঁদ্রে বুশে-র সঙ্গে নামে Forêts *L'éphemère* শিল্পকলা ও সাহিত্যের এক পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। সেই সময় থেকেই শিল্পকলা বিষয়ক একাধিক গবেষণাধর্মী কাজে ডুবে যান বনফোয়া। ১৯৭২ সালে একটি অদ্ভুত আত্মজীবনী লেখেন বনফোয়া। *L'Arrière-pays* নামে । অনেকে বইটিকে একটি আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক আত্মজীবনী বলেছেন। "arrière-pays" একটি যৌগিক শব্দবন্ধ যার অর্থ উপকূলের নেপথ্য-ভূমি। সাগর বনফোয়ার কবিতার সিংহভাগ জুড়ে আছে। সাগরকে অনেকভাবে জীবনের অনেক ভঙ্গিমায় দেখা। উপকূলের পেছনে লুকনো অঞ্চলকেই হয়তো বনফোয়া তাঁর আভ্যন্তরীন দার্শনিকতার প্রতিরূপে দেখতে চেয়েছেন।

বনফোয়ার কবিতা নিয়ে অল্পপরিসরে আলোচনা প্রায় অসম্ভব। এক একজন কবি আছেন যাঁর কবিতা আত্মা, জ্ঞান, ঐতিহ্য, অনুভূতি ও দার্শনিকতার এমন গভীরে প্রোথিত, যে সামান্য কয়েক ছত্রে তাঁর কবিতাবিচার অন্যায়। কবিতা সম্বন্ধে বনফোয়ার চিন্তাভাবনাও দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে বিবর্তিত ও বিবর্ধিত। তবু কয়েকটা সামান্য আঁচড়ে বনফোয়ার কবিতাকে আঁকতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তাঁর সাত্ত্বিক কাব্যভাষার কথা। বনফোয়া কবিতায় কেবল মৌলশব্দ ব্যবহার করেন। 'সমুদ্র', 'আকাশ', 'মাটি', 'জল', 'গাছ', 'পাখি', 'ফুল', 'পাথর', 'গাছ', 'স্রোত', 'মরু', 'ফল', 'ফেনা' - এই সমস্ত মৌলশব্দের সম্মেলনেই তাঁর কবিতার ভাষা। কোন বিশিষ্ট নাম শব্দের উচ্চারণ যেন কবিতায় বারণ। ফলে বনফোয়া কখনো কোন ফুলের নাম করেন না, কখনো বলেন না কোন পাখি, তাঁর কবিতায় কোন শহর নেই, গ্রাম নেই, সময়কাল নেই, তাঁর সমুদ্র ভূগোলের মধ্যে থেকেও বিশেষত্বহীন। অপরিহার্য বা quintessential শব্দপ্রতিমার ওপর ভর করে আছে তাঁর কাব্যসমগ্র।

শব্দ বনফোয়ার কবিতায় নিজেকে বারবার নতুন অর্থে, প্রকল্পে খুলে মেলে ধরতে থাকে। মৌল শব্দের পক্ষে এই কাজটি অত্যন্ত কঠিন, কারণ মৌল শব্দ আধ্যাত্মিক। তার সত্ত্বায় সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক স্নেহ পদার্থ জমে ওঠেনি। সেইসব শব্দের পুনর্জন্ম কবিতার ভাষায় নিয়ে আসা বড় কবির কাজ। 'সান্ধ্যভাষা' কবিতায় বনফোয়া লেখেন - 'আগুয়ান রাতের স্বচ্ছতা, বয়ানের স্বচ্ছতা / যা কিছু জীবন্ত, যেভাবে তার কুয়াশা উঠে আসে'। এই কুয়াশাই কি জীবিতের সেই সারাংশ যার সন্ধানে কবি ও কবিতা নিয়োজিত ? একই সঙ্গে রয়েছে এক পুনরুত্থানের কথা। 'হৃদয়, নির্মেঘ জল' কবিতায় বনফোয়া লিখছেন - 'কোন পাখির পায়ের ছাপ নেই/ ঐ কাঁচের ছাদে/ বাগান ও ছায়ায়/ ছিন্নভিন্ন হৃদয়//তোমার ভাবনাই/ আমার জীবন শুষে নিয়েছে/ অথচ কোনই স্মৃতি রাখেনি/ এই পাতাগুলি'। পাতাদের স্মৃতি নেই যেমন, তেমনই নেই কাঁচের ওপর কোন পাখির পায়ের ছাপ। পুনরুজ্জীবন মাত্রেই তো তাই। একটি শূন্য শ্লেট থেকে আবার লেখা শুরু। স্মৃতিহীনতা এখানে মৃত্যু নয় সম্ভবত, নতুন জীবন। বা হয়তো মৃত্যুই নতুন সূচনার বাজনা। যেমন 'রক্ত, কোমল সা' কবিতায় বনফোয়া বললেন - 'ঘাড়টা যখনই টান টান লাগে / ফাঁকা চিৎকার তোমার পবিত্র মুখে ফিরে এল'। শূন্যতায় নিমজ্জিত, মৃত্যুতে রিক্ত হয়ে এই দাগহীন ফিরে আসার বাণী বনফোয়ায় কবিতার আবহে যত্রতত্র শোনা যাবে।

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বহু কবিই নানারকম দার্শনিকতায় ভুগেছেন। বনফোয়ার কবিতায়, সেই 'দ্যুভের চলাচল ও অচলতা বিষয়ক' কাব্যগ্রন্থ থেকেই মৃত্যু পুনর্জন্মের আগের পর্যায়। 'গাছ, বাতি' কবিতায় যেমন, বনফোয়া দেখতে পাচ্ছেন - 'গাছের গভীরে ঐ গাছ বুড়ী হয়, এখন গ্রীষ্ম / পাখিটা তার কাকলি টপকে উড়ে গেছে'। সত্ত্বার গভীরে একটি অন্তর্সত্ত্বা প্রায়শই বনফোয়াকে সাড়া দেয়। সেইই গাছের ভেতরের গাছটা। সে যেমন একাধারে বুড়ো হয়, পাখিটা ঠিক তার উল্টোক্রিয়ায় তার নিজের গান টপকে অন্য কোথাও উড়ে গেছে। দুটো দৃশ্যেই পুনর্জন্মের বীজ পোঁতা। প্রায় একই সময়ে লেখা 'ঘর' কবিতায় আবার বনফোয়া বললেন - পবিত্র হাতটা উদ্বিগ্ন হাতের পাশে ঘুমলো। দ্যুভ-এর কবিতামালায় তিনি লিখেছেন -

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আমার মুখের ওপর চিৎকার করে উঠেছিল যে
তার কন্ঠস্বর স্তব্ধ ; আমরা বিচ্যুত, ভিন্ন
ওর চোখ কঠিন হয়ে গেছে তবু আমি দ্যুভকে মৃত ধরে আছি
আমার আত্মার সাথে আবদ্ধ

আর যতই শীত উঠে আসুক তার সত্ত্বা থেকে
যতই তীক্ষ্ণ হয়ে কাটুক আমাদের আলিঙ্গনের বরফ
দ্যুভ, আমি তোমার মধ্যে কথা বলি এখনো ; আমি আঁকড়ে
ধরি তোমাকে জানতে ও জানাতে চেয়ে

মনে হবে সঙ্গমরতা প্রেমিকার মৃত্যু ঘটেছে ; তবু তার শেষ উত্তাপকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, যেভাবে তার নিজের কন্ঠ ভেন্ট্রিলোকুইস্টের মত তার শরীরে ছুঁড়ে কবি বাঁচিয়ে রেখেছে তার প্রেমিকাকে। এইভাবে বারবার বনফোয়া মৃত্যুকে জীবনের একটি পূর্বস্তর হিসেবে দেখতে চান। মৃত্যু ফিকে হয়ে একটা আবছা, সাময়িক অনস্তিত্ব হয়ে যায়।

বনফোয়া আজীবন বাস্তব ও কবিতার আত্মার সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছেন। অস্তিত্বকে মেনে নিলে তার শুরু ও শেষকে মেনে নিতে হয়। মৃত্যুকে এক শেষ যতি হিসেবে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকেনা। ফলে অস্তিত্বের প্রশ্নটি বনফোয়ার কবিতায় বরাবরই তর্কময়, নিরবচ্ছিন্ন। এক সময় বনফোয়া বলেছিলেন - কবিতার কাজ বস্তুকে তার সঠিক পরিচয় ফিরিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ফ্রান্সের দুই উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-দার্শনিক জর্জ বাতাইয়ে ও মরিস ব্লাঁশোত। এঁদের সঙ্গে ইভ বনফোয়ার একটি মানসবন্ধন তৈরি হয়। বনফোয়া তাঁর নানা প্রবন্ধে, কবিতাভাষণে এ কথা বলেছেন যে কবিতা রচনা ও পাঠের প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়ে গেছে একটা 'বাসনা' বা 'ইচ্ছে'। কবির বাসনা বিষয় বা বস্তুর বিবিধ অর্থের অনুমোদন করা। একটি বাস্তবতাকে গড়ে তোলা যার অস্তিত্ব ছিল না। বস্তুকে মুক্ত করা, তাকে ঘিরে রাখা অজস্র পূর্ব-অভিজ্ঞতার লোমশ বেষ্টনী থেকে। তাকে নিজের মত করে দেখাতে পারার বাসনা। একইসঙ্গে পাঠক, যিনি কবিতা পড়ছেন, তাঁর বাসনা কবিতাকে নিজের চেনা বাস্তবতা, বা তাঁর একান্ত নিজস্ব বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। এই দুই বাসনার অভিঘাতে নির্মিত হতে থাকে কবিতামুক্তির প্রকৃতপথ। ব্লাঁশোতের প্রসঙ্গে বনফোয়া একবার লেখেন - কবিতার অর্থকে তার ভাষার কাঠামোগত সম্পর্কগুলির আলোয় দেখলে চলে না, বরং বুঝতে হবে বিন্যাসকে ধীরে ধীরে ভেঙে ফেলার যে কাজ চলছে, কবিতার পংক্তির অর্থ তারই অভিজ্ঞান । অসম্ভবই স্বাভাবিক, কারণ তার কোন আকৃতি নেই। আর সম্ভাবনা হল নানা গতির পরিপাকের মাধ্যমে একটি বিশেষ আকৃতিকে, একটি বিশেষ বাস্তবতাকে ধারণ করার প্রবণতা। যে ইচ্ছে বা বাসনা থেকে কবিতা পড়া ও লেখা, সেই ইচ্ছে অসম্ভবের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। সেখানেই রয়েছে নতুন অর্থ। এইভাবেই কম্যুনিকেট করতে চাওয়ার একটা ইচ্ছে জন্মায় কবি ও পাঠকের মধ্যে। একইসঙ্গে কবিতা ও তার লেখকের মধ্যে বা কবিতা ও তার পাঠকের মধ্যে।

অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যায় যে কোন একটি বিখ্যাত কবিতার একটি নিপুণ ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন একজন পাঠক বা সমালোচক। এটি যে সেই পাঠক বা সমালোচকের নিজস্ব নির্মাণ - এর সঙ্গে যে কবির কোন সম্পর্কই নেই (হয়ত) এটা তাঁকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন প্রায়শই হয়ে পড়ে। এইভাবেই একজন পাঠক বা সমালোচকও ও একটি কবিতার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হন, কম্যুনিকেট করেন। এই যোগাযোগ করতে চাওয়ার বাসনার মধ্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে আরো কয়েকটি জিনিষের। অচেতন আকাঙ্খার বর্জন। এই অচেতন আকাঙ্খা বস্তু, ভাবনা বা বিষয়ের স্বাভাবিক মুক্তসত্ত্বাকে নষ্ট করে এবং সেতু গড়ে তোলার বদলে তার কাঠে-কংক্রিটে আগুন ধরাতে থাকে। বনফোয়া একবার লিখেছিলেন, কবিতা সেই সূত্র যার কাছে কবিকে বার বার ফিরে আসতে হয়। শব্দই হয়ে ওঠে সেই 'বাসনা' ; এবং কবিকে তার সূত্রে ফিরিয়ে নিয় আসতে চায়। হ্রেনে শার একই ভাবনায় একবার বলেছিলেন - কবিতা, বাসনার সেই সত্যিকারের প্রেম, যার এখনো আরো বাসনা রয়েছে।

বনফোয়া ভ্রমণ করেছেন প্রচুর। সাহিত্যের অধ্যাপক ও শিল্প-গবেষক হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছেন বহু দেশ। প্রায় গোটা ইউরোপ। আমেরিকার ব্র্যান্ডাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬২-৬৪) সালে। এছাড়াও জন হপকিন্স ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। শেকসপীয়রের অনুবাদ করেছেন ফরাসী ভাষায়। অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রান্সে।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ইভ বনফোয়ার চারটি কবিতা

(মূল ফরাসী ও ইংরেজি তর্জমার সাহায্যে বঙ্গানুবাদ ঃ আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)

আবার গ্রীষ্ম

বরফের ওপর হাঁটি। চোখ বন্ধ করলাম
তবু আলো জানে পক্ষ্ম ছেঁকে নেমে আসা
আর আমি টের পাই আমার শব্দের ভিতর এখনো ঐ ঝুরো তুষারকণা
ঘোরে, ফেরে, ভারী হয় ও ছিলকায় ছিঁড়ে যায়।

তুষার,
ফিরে পাই চিঠিপত্র আর ভাঁজ করিঃ
তার কালি পুরনো হয়েছে , অস্পষ্ট হয়েছে
মনের যে বিচিত্র, তাকে ঠকিয়ে
তার নিপুণ ছায়াটাকে কি প্রবল ঘোলা করে তোলে।

আমরা পড়ার চেষ্টা করি, স্মৃতি থেকে তাকে অনেক লড়েও তুলে আনতে ভুল করি
কে আর আমাদের জীবনের দিকে এত আগ্রহে তাকিয়ে আজ - এক যদি না
গ্রীষ্ম আবার ; এক যদি না আবার দেখা যায় পাতাদের তুষারের নীচে,
আর তাপ উঠে আসে ঐ ঢাকা মাটি থেকে কুয়াশার মত।

বাগান

নক্ষত্র, ঐ উঁচু বাগানের দেয়াল থেকে ঝুলে আছে
দূরের গাছে ফলের মত, অথচ গোরস্থানের পাথর
ফুটে উঠছে বৃক্ষদের যাবতীয় ফেনা কাটিয়ে,
জাহাজের অগ্রভাগের ছায়া, স্মৃতিরও।

নক্ষত্র, শুদ্ধ রাস্তার খড়ি,
ফিকে হয়, আমাদের বাগান কেড়ে নেয়,
এবং আকাশপথে আঁধার এলো
এই ভাঙা জাহাজের গানের ওপর,
আমাদের অচেনা রুটের ওপর।

মৃতদের জায়গা

মৃতদের জায়গা
লাল সাটিনের এক ভাঁজ হয়তো,
ওর খসখসে হাতে পড়ে যেতে পারে ; ডুবে যেতে পারে
লাল রঙের সৈকতরক্তগুচ্ছে ;
আয়নার জন্য সাজিয়ে রাখতে পারে
একটি অন্ধ মেয়ের ধূসর শরীর ; খিদের জন্য
পাখিদের গানে ঐ ডুবন্ত কিশোরীর হাত।

নাকি ওদের দেখা হয়েছিল মেপল বা ডুমুর গাছের নীচে ?
ওদের সাক্ষাৎ কে কোন শব্দ বিরক্ত করেনা
গাছের চূড়ায় দেবী দাঁড়িয়ে
তিনি সোনার কলস তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন।

মাঝে মাঝে দেবতার হাত ঐ গাছে গাছে ঘোরে
আর পাখিরা, আর অন্য পাখিরা, শব্দ করেনা।

রক্ত, কোমল সা

দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন।
রক্তের সংগ্রাম রক্তের বিরুদ্ধে, অক্লান্ত।
ঐ সাঁতারু অন্ধ।
সে রক্তিম গমকে গমকে তোমার হৃদয়ের শব্দে পড়েছে।

ঘাড়টা যখনই টান টান লাগে
ঐ ফাঁকা চিৎকার তোমার পবিত্র মুখে ফিরে এলো।

ফলে, বুড়িয়ে গেল গ্রীষ্ম। ফলে মৃত্যু
নাচুনে শিখাটির আনন্দ জুড়েছে।
এবং আমরা অল্পই ঘুমোতে পারি। কোমল সা
রক্তিম সাটিনে রেখে এল এক অনন্ত প্রতিধ্বনি।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com